International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-VI, Issue-II, September 2019, Page No. 28-35
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v6.i2.2019.28-35

সাহিত্যিক ও চিত্রশিল্পী – রানী চন্দ

দিলীপ মণ্ডল
গবেষক, বাংলা বিভাগ, অ্যাডামাস ইউনিভার্সিটি

Abstract

In Bengali literature, the most subdued literary figure is Rani Chanda. On 19th Oct,1912. She was born in Ganderia in Dacca. She was the sibling of a renowned artist named Mukul Dey. Rani Chanda became father less, at the age of four. In 1928, Rabindra nath Tagore took her to Kalabhaban and under the able guidance of Nandalal Bose, She started taking lessons in art. She was natured under the loving care of Rabindra nath and Abonindro nath. Many unknown facts about Tagore's family are brought to limelight from the essays of Rani Chanda. She was the Lady, whose paintings were first d isplayed in the All India Fine Art and Crafts, New Delhi, She is the first women writer under whose personal experience, the horrors of living behind bars of the women has been exposed through her writings. Her 'PURNO KUMBHO' novel based on travelogue received Rabindra Award, and became one of the most renowned Novels of her time, thereby touching the hearts of many readers. In the world of relevance to day, where researchers work on Tagore and Abonindra nath. The researchers work would be incomplete without going through the work of Rani Chanda. But ironically, the wonderful creations of Rani Chanda is not available in our book stores, nor in libraries. Her superb creations are found in notable places of India in Rastrapati Bhavan, Raj Bhavan and even in many embassies, there has been no research on her or her works till date.

Keywords: Subdued, Natured, Limelight, Researchers, Travelogue.

১৯৪০ সালে উদয়ন গৃহে ২৮শে নভেম্বর সকাল বেলা "রোগশয্যায়" কাব্য গ্রন্থের একটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—

'জীবনের দুঃখে
শোকে তাপে
ঋষির একটি বাণী চিত্তে মোর
দিনে দিনে হয়েছে উজ্জ্বল-
আনন্দ-অমৃত-রূপে বিশ্বের
প্রকাশ।'[১]

শিল্পী, সাহিত্যিক বা মহানস্রষ্টা তিনিই হতে পারেন, যিনি দুঃখের দহনজ্বালা কণ্ঠে ধারণ করে জগতের কল্যাণের জন্য অমৃত ধারা বর্ষণ করেন। জগৎকে তিনি দেখেন আনন্দ ও অমৃতের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ রূপে। অন্য সবার মতো তাদেরও থাকে সাধারণ ঘরকন্যা। সুখ-দুঃখ কিন্তু এসবকে অতিক্রম করার জন্য দরকার প্রাণের অফুরন্ত উল্লাস, মনের সুগভীর আনন্দ। বাংলা সাহিত্যের প্রাঙ্গন মাতানো এই রূপ একজন সাহিত্যিক ও চিত্রশিল্পী হলেন— রানী চন্দ।

রোগশয্যায় কবি ররীন্দ্রনাথ ঠাকুর রানী চন্দকে বলেছিলেন- 'এক হিসেবে নারী হচ্ছে ইউনিভার্সাল, তোদের স্থান হচ্ছে সৃষ্টির মূল। দয়া-সেবা-লালন-পালন, এতেই তোদের সত্যিকার রূপ প্রকাশ পায়। পুরুষ যেমন বিধাতার স্বতন্ত্র সৃষ্টি, কিন্তু মেয়েদের বেলায় তা নয়। নারী মিলিয়ে এক নারী।'[২] আর এই দিনই কবি লেখেন 'নারী' কবিতাটি—

'যে অভাগ্য নাহি লাগে কাজে,
প্রাণলক্ষী ফেলে যারে আবর্জনার মাঝে
তুমি তারে আনিছ কুড়ায়ে,
তার লাঞ্ছনার তাপ স্নিগ্ধ হিস্তে দিতেছ জুড়ায়ে।'[৩]

কবিতাটি রানী চন্দকে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন- 'তোকে উপলক্ষ করে বিশ্বের নারীদের লিখছি, রোগী তোদের কাছে দেবতার মতো।'[৪] সারা জীবন ধরে স্নিগ্ধ হস্তে লাঞ্ছনার তাপ সরিয়ে যিনি প্রাণলক্ষীর অশেষ আনন্দ বিতরণ করে গিয়েছেন- তিনিই রানী চন্দ। জন্মের একশত বর্ষ পার করে প্রায় বিস্মৃতির অন্তারালে চলে যাওয়া একজন লেখিকা। স্বল্প আলোচিত একজন স্রষ্টা। অথচ একটা সময় যিনি বাংলা সাহিত্যের প্রাঙ্গন মাতিয়ে চলেছিলেন তার গদ্য শৈলীর মনমুগ্ধকর মন্ত্রের দ্বারা। তিনি প্রথম মহিলা লেখিকা যার নিজস্ব অভিজ্ঞতায় মহিলা কয়েদীদের দুঃসহ কারাজীবন চিত্র প্রকাশিত হয়েছিল। তার রচিত পূর্ণকুম্ভ উপন্যাস প্রথম বৈরাগী সুরে বাধা-রবীন্দ্র পুরষ্কার প্রাপ্ত সারা জাগানো ভ্রমণ উপন্যাস। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্র ও অবনীন্দ্র গবেষকদের প্রথমে ছুটে যেতে হয় রানী চন্দের গ্রন্থের মধ্যে। আবার তিনিই ভারতের প্রথম মহিলা শিল্পীর সম্মান পেয়েছিলেন- যার আঁকা ছবি এককভাবে প্রথম প্রদর্শিত হয়েছিল দিল্লীর আইফাকাসে অথচ তার রচিত গ্রন্থগুলি এখন বইপাড়ায় মেলে না। মেলে না নামি গ্রান্থাগারেও। আজ পর্যন্ত রানী চন্দ সম্পর্কে বিস্তারিত কোনো গবেষণা হয় নি। বর্তমানে আমরা তাঁর সাহিত্য ও চিত্র শিল্পে অবদানের স্বরূপটি নিয়ে আলোচনা করবো।

১৯১২ সালে ১৯শে অক্টোবর রানী চন্দের জন্ম ঢাকার গণ্ডরিয়ায়। পিতা কুল চন্দ দে-এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত নিবিড়। বড়দা মুকুল চন্দ্র দে ছিলেন কলাভবনের প্রথম দিক-এর ছাত্র। ১৯২৮ সালে রবীন্দ্রনাথের চেষ্টায় কলাভবনে নন্দলাল বসুর কাছে রানী চন্দের শিক্ষা লাভ শুরু হয়। ১৯৩৩ সালে বম্বের টাটা প্যালাসে অনিল চন্দের সঙ্গে তার বিবাহ এবং মৃন্ময়ীতে প্রথম সাংসারিক জিবনের সুত্রপাত। সারা জীবন তিনি দু'জন মানুষকে ভগবানের মতো শ্রদ্ধা করতেন। একজন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অন্যজন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শৈশব থেকে তাদের স্নেহ, ভালোবাসা, গাইডেন্সে বড়ো হয়েছেন। তাই তার জীবনের ইচ্ছা ছিল কোন দিন নিজেকে স্বতন্ত্র করে পরিচয় দেওয়ার দরকার নেই। নিজেকে লেখিকা হিসেবে, চিত্রশিল্পী হিসাবে পরিচয় দেওয়ার জন্য তার কোন ব্যস্ততা ছিল না। তার মনে যেন ছিল আমি রানী চন্দ কেউ নয়, সবাই জানুক আমি ছোটবেলা থেকে যাদের স্নেহ ভালোবাসা পেয়েছি তারা কেমন ছিল। তাদেরকে জানানোই যেন তার জীবনের চরম উদ্দেশ্য ছিল। রানী চন্দের লেখায় যেন সেই উদ্দেশ্য ফুটে ওঠে। তার রচিত সাহিত্যগুলি হল—

স্মৃতিকথামূলক রচনা- (১) গুরুদেব - ১৩৬৯
(২) সব হতে আপন - ১৩৯১
(৩) শিল্পী গুরু অবনীন্দ্রনাথ - ১৩৭৯

(৪) আমার মা'র বাপের বাড়ি - ১৩৮৪

দিনলিপিমূলক রচনা -- (১) আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ - ১৩৪৯

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থের অনুলিপিকার—
(১) ঘরোয়া - ১৩৪৮
(২) জোড়াসাঁকোর ধারে - ১৩৫১

ভ্রমণ সাহিত্য -- (১) পূর্ণকুম্ভ - ১৩৫৯
(২) হিমাদ্রি - ১৩৬৩
(৩) পথেঘাটে - ১৩৮৪

কারা উপন্যাস -- (১) জেনানা ফাটক - ১৯৮৩
চিত্র সম্পাদনা -- (১) কুটুম কাটাম - ১৯৮৭

সময়গত দিক থেকে দেখলে তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ হল 'ঘরোয়া' অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই গ্রন্থখানিটিতে তিনি অনুলিপিকারের কাজ করেছেন। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ঘরোয়া' ও 'জোড়াসাঁকোর ধারে' গ্রন্থে দুটিকে একই সঙ্গে দু'জনের বলে চিহ্নিত করে দিয়েছেন। 'ঘরোয়া' গ্রন্থটি ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। ধীরে ধীরে গ্রন্থটির দশ-দশটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থের এই সংস্করণ প্রবণতা বুঝিয়ে দেয় যে গ্রন্থটি কতখানি জনপ্রিয়তা লাভ করছে। বক্তা অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর গল্প বলার ভঙ্গিতে বলে গেছেন আর লেখিকা রানী চন্দ অন্তর দিয়ে তার গল্প বলার ভঙ্গিতে গল্পকে ধরে রেখেছেন। রানী চন্দ লিখছেন— 'তাঁর গল্প বলার ভঙ্গি যে না দেখেছে, ভাষা যে না শুনেছে, সে তা বুঝবে না; লিখে তা বোঝানো অসম্ভব। ...নানা প্রসঙ্গে নানা গল্পের ভিতর দিয়ে অনেক মূল্যবান কথা, ঘটনা শুনতুম, দুঃখ হতো, লিখতে জানিনে; তবুও এসব অমূল্য কাহিনী কেউ জানবে না, নষ্ট হয়ে যাবে, এ সইত না-খাতার পাতায় অবসর সময়ে লিখে রেখে দিতুম।'[৫] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অসুস্থতার সময় জোড়াসাঁকোর বাড়িতে অসুস্থ রবীন্দ্রনাথকে সেবাসুশ্রূষার জন্য যখন অনেকের সঙ্গে রানী চন্দ ছিলেন- সে সময় প্রায়ই অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর রবীন্দ্রনাথের খোঁজ নিতে আসতেন। সে সময় প্রায়ই অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর রবীন্দ্রনাথের খোঁজ নিতে আসতেন। সে সময় নানান গল্প করতেন। যেগুলি অবসর মতো ডায়েরির পাতায় রানী তুলে রেখেছিলেন। মাস দুয়েক পরে রবীন্দ্রনাথ সুস্থ হয়ে দলবল নিয়ে যখন শান্তিনিকেতনে ফিরে গেলেন এবং আবার ছবি আঁকা ও লেখায় মন দিলেন সে সময় একদিন রানীকে চুপচাপ বসে থাকতে দেখে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন— 'রানী, তুই একটু লেখার অভ্যেস কর না। কিছু ভাবিস নে- বেশ তো, যা হয় একটা কিছু লিখে আণ, আমি দেখিয়ে দেব।'[৬] কিন্তু নিজের লেখা না পেয়ে একদিন তিনি বললেন- 'নিজের লিখবার মতো কিছুই খুজে পাচ্ছি না, ও আমার হবে না, তবে একটা ইচ্ছে আছে- এবারে অবনীন্দ্রনাথের কাছে গল্পচ্ছলে অনেক মুল্যবান কাহিনী ও কথা শুনেছি, যা আমার মনে হয় পাঁচজনের জানা দরকার।"[৭] এরপর রবীন্দ্রনাথ লেখাগুলি পড়ে রানীকে বলেছিল- 'এ অতি সুন্দর হয়েছে। অবন কথা কইছে, আমি যেন শুনতে পাচ্ছি।"[৮] পরে রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছানুযায়ী প্রবাসী প্রত্রিকায় লেখাগুলি প্রকাশিত হয়। এবং এই গ্রন্থের জন্য ঐ বছর জুন মাসে রবীন্দ্রনাথ রানী চন্দকে কোলকাতায় পাঠিয়েছিলেন, দিন সাতেক থেকে বেশ কয়েকটি গল্প সংগ্রহ করে নিয়ে গিয়েছিলেন। এরপর আরেকবার জুলাইয়ের মাঝামাঝি অবনীন্দ্রনাথের কাছে এসেছিলেন ঘরোয়ার জন্য গল্প নিতে, তখন রবীন্দ্রনাথের অপারেশানের কথা চলছিল। শেষে গুরুদেবের ইচ্ছানুযায়ী এই বই ছেপে বের হলো, কিন্তু মাত্র কয়েকটা দিনের জন্য রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থটি দেখতে পেলেন না। রানী চন্দ লিখেছেন- 'আজ এই বই হাতে নিয়ে তাঁকে বার বার প্রণাম করছি, আর প্রণাম করছি অবনীন্দ্রনাথকে, যিনি গল্পচ্ছলে আমার ভিতর এই রসের ধারা বইয়ে দিলেন।'[৯] আর অবনীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থের সম্পর্কে লিখেছেন- 'আমি বলেছি, তুমি লিখেছো, আমার ঝুলিতে এতো কথা জমা আছে যা এক তুমি ছাড়া কেউ লিখে উঠতে পারতো না, আমার ভাগ্যক্রমে তোমার হাতে আমার খাপছাড়া ঘরা ও কথা-

ভালো করে গেঁথে দেওয়ার ভার রবী কাকা দিয়েছেন, না হলে ঘরা ও কথা ঘর চাপা পড়েই থাকতো। ছাপা হয়ে বেরোতো না।'[১০] রানী চন্দের কৃতিত্ব ঠিক এখানেই। স্বদেশী প্রসঙ্গ থেকে শুরু করে ঠাকুরবাড়ীর সদস্যদের অপরিচিত রূপকে আমাদের সামনে যেভাবে তুলে ধরেছেন তা এক কথায় অনবদ্য।

'ঘরোয়া' ছড়া 'জোড়াসাঁকোর ধারে' গ্রন্থটিতে রানী চন্দ অনুলিপিকারের কাজ করেছেন, গ্রন্থটির শুরুতে বিশ্বভারতীর আচার্য্যের প্যাডে অবনীন্দ্রনাথ লিখেছেন 'যত সুখের স্মৃতি তত দুঃখের স্মৃতি আমার মনের এই দুই তারে যা দিয়ে এই সব কথা আমার শ্রুতিধরী শ্রীমতী রানী চন্দ এই লেখায় ধরে নিয়েছেন, সুতরাং এর জন্য যা কিছু পাওনা তাঁরই প্রাপ্য। সুখের কথা লেখার টানে ধরে রাখা সহজ নয়। প্রায় বাতাসে ফাঁদ পাতার মতো কঠিন ব্যাপার সুতরাং যদি কিছু দোষ থাকে এই বইখানিতে, আমি নিতে রাজি হলেম।'[১১] বোঝা যায় সুখের ও দুঃখের স্মৃতি মিলিয়ে এই গ্রন্থ রচনা, লেখিকার লেখার ব্যাপারে স্বীকৃতি জানিয়েছেন স্বয়ং অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আর দোষ বা খারাপ নিজের ঘারে তুলে নিতে চেয়েছেন। বক্তা ও শ্রোতার এক আশ্চর্য হৃদয়ের টানে এই গ্রন্থ হয়ে উঠেছে এক সার্থক সৃষ্টি। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কেও ঠাকুর বাড়ির অনেক অজানা কথা প্রকাশ পেতো না যদি না রানী চন্দ গ্রন্থখানি লিখতেন। তার লেখার মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠেছে- অবনীন্দ্রনাথের জীবন চর্চা থেকে শুরু করে তার জীবন দৃষ্টি ও শিল্প ভাবনার নানান দিক। অবনীন্দ্রনাথের শৈশব বেলার নানান ঘটনা যেমন রয়েছে- তেমনি রয়েছে ক্ষীরের পুতুলের ষষ্ঠীবুড়ির কথা, রয়েছে কোন্নগরের বাগান বাড়ীর প্রসঙ্গ, জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ী মাড়োয়ারীদের হাতে চলে যাওয়া ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গে রানী চন্দ তার বর্ণনায় নিজেকে অন্তরালে রেখে— অবনীন্দ্রনাথ ও ঠাকুরবাড়ী কথা স্পষ্ট করে দিয়েছেন আমাদের কাছে। শৈশবে নর্মাল স্কুল প্রসঙ্গে রানী চন্দকে অবনীন্দ্রনাথ বলেছিলেন- "স্কুলের একটি ঘরে কাচের আলমারিতে তোলা একখানি খেলনার জাহাজ আর গোটা কয়েক নানা আকারের শঙ্খ, বেশিরভাগ সময় কাচের আলমারির সামনে বসে বসে সেগুলি দেখি। জানো, আমার ছবি আঁকার হাতেখড়ি হয় সেখানেই, ঐ নর্মাল স্কুলেই।"[১২] অবনীন্দ্রনাথ সম্পর্কে ঠাকুর বাড়ি সম্পর্কে বাঙালি পাঠক যখন জানতে চাইবে— তখন ছুটে যেতে হবে তাকে রানী চন্দের এই গ্রন্থটির কাছে।

'আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থটি ১৩৪৯-এর ২২শে শ্রাবণ প্রথম প্রকাশিত হয়। সংলাপের আঁকারে রচিত ডায়েরি ধর্মী এই গ্রন্থটিতে ১৯৩৪ সালের ৭ই জুলাই থেকে শুরু করে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত মোট প্রায় আট বছরের সম্পদে ভরা খাতার পাতায় যা ধরে রেখেছিলেন রানী চন্দ। রবীন্দ্রাথের সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপ আলোচনা তা প্রকাশ করলেন সবার সামনে সবার জন্য। রানী চন্দ লিখেছেন- 'নিজের খেয়াল খুশি মতো ব্যক্তিগত আলাপ-আলোচনা খাতার পাতায় কখনো কখনো রেখে দিতুম। কতদিনের কত কথা স্মৃতির আড়ালে হারিয়ে ফেলেছি, যেটুকু রেখে ছিলুম তাই খুঁজে বের করে আজ বারে বারে চোখের সামনে ধরছি- তাঁর কথা যেন এখানে কানে শুনতে পাই। তাঁকে স্পষ্ট দেখি সামনে। তাঁর মুখের নতুন নতুন বাণী আর পাব না, আর কেউই পাবে না। তাই এ জিনিস এলাকার জন্য রাখতে নেই। এ শুধু আমার ব্যক্তিগত কথা বা প্রশ্নের উত্তর নয়, এর মধ্যে অনেকেই অনেক কিছু পাবেন, এই ভেবেই এ যেমন ছিল তেমনি সবার সামনে এনে দিলুম।'[১৩] গ্রন্থ রূপে প্রকাশ পাওয়ার পূর্বে লেখাগুলি রানী চন্দ অবনীন্দ্রনাথকে দিয়েছিলেন দেখার জন্য অবনীন্দ্রনাথ বলেছিলেন- "রবীকাকার সঙ্গে তোমার আলাপচারীগুলি পড়তে পড়তে যেন রবীকাকারই কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেম, তাঁকে দেখতেও পেলেম সুস্পষ্ট। এই বই তো ছাপা হবেই, আমাকে দিতে ভুলো না। তুমি কি মন্ত্রে লেখা দিয়ে আঘটন ঘটাও, এনে দাঁও হারানো মানুষকে ভাবতে আমি অবাক হই।[১৪]

১৩৬৯ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর স্মৃতিকথামূলক রচনা 'গুরুদেব' গ্রন্থখানি। গ্রন্থটির শুরুতেই রয়েছে- 'সন তারিখ মনে নেই- মনে থাকেও না; তখন বেশ বড়ো হয়েছি, বিক্রমপুর থেকে কলকাতায় এলাম আমার মায়ের সঙ্গে, কিছুকাল বাদে বড়দা দেশে ফিরে এলেন বিলেত হতে বারো বছর পরে। এসেই চললেন শান্তিনিকেতনে গুরুদেব রবীন্দ্রানাথকে প্রণাম করতে; সঙ্গে নিলেন- দিদি আমি- দুই বোন কে"[১৫] এইভাবেই শুরু করলেন রানী চন্দ। তাঁর

প্রথম শান্তিনিকেতন যাত্রার কথা- অপরাহ্নের বেলায় লম্বা ইন্টার ক্লাসের এক কামরায় জানালার ধারে দুই বোন মুখোমুখি বসে যাত্রা শুরু করেছেন। সঙ্গে একটু আড়ষ্ট, ভীতভাব- বুকে চাপা উল্লাস। কারণ এতদিন শহর বলতে জানতেন ঢাকা আর গ্রাম বলতে শ্রীধরপুর- মামার বাড়ি, জ্ঞান হয়ে শহরে ঘুরাঘুরি এই প্রথম, তাঁর সঙ্গে গুরুদেবকে প্রথম বার স্বচক্ষে দেখতে চলেছেন। এতদিন মায়ের ট্রাঙ্ক থেকে ছবি দেখেছেন। রবীন্দ্রানাথের হাতের লেখা দেখেছেন। আশ্রমের অনেক স্কেচ ও গল্প শুনেছেন বড়দা মুকুল দে-র কাছ থেকে, এবার সব কিছু নিজের চোখে দেখবেন। ১৯২৭ সালে কলকাতায় আগমন থেকে শান্তিনিকেতন যাত্রা দিয়ে গ্রন্থটির শুরু আর ১৯৪১ সালে ২২শে শ্রাবণ রবীন্দ্রনাথের শেষ যাত্রার বর্ণনা দিয়ে গ্রন্থটির সমাপ্তি। দীর্ঘ চোদ্দ বছরের স্মৃতিকথা রানী চন্দ আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেছেন। যা ছিল তাঁর ব্যক্তিগত স্মৃতি তা সবার জন্য লিখে দিয়েছেন। তাঁর এই লেখার মূল্যে গ্রন্থটি শুধুমাত্র স্মৃতির ঘটনা হয়ে থাকেনি, তা হয়ে উঠেছে এক আদর্শ স্মৃতিসাহিত্য।

স্মৃতিকথামূলক তাঁর অপর একটি গ্রন্থ হল 'সব হতে আপন'। ১৩৯১ সালের ২৫শে বৈশাখ বিশ্বভারতী প্রকাশনা থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। রানী চন্দের এটি সর্বশেষ রচনা। গ্রন্থটিতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শান্তিনিকেতনের আসা থেকে শুরু করে জীবনের শেষ পর্বে জিৎভূমে একাকী থাকা পর্যন্ত এক অনবদ্য স্মৃতিচারণা করেছেন তিনি। ফেলে আসা দিনের ঘটনার মালা যেন তিনি আমাদেরকে উপহার দিয়েছেন। গ্রন্থের শুরুতে রয়েছে ১৯১৬ সালে পিতা কূলচন্দ্র দে মারা যাবার পর রানীদের সবাইকে নিয়ে শান্তিনিকেতনে আসতে বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, গ্রন্থটিতে রয়েছে- চৌরঙ্গির আর্ট কলেজের দোতলায় মুকুল দে প্রিন্সিপাল হলেন- সেই সময় কিছু দিনের জন্য রবীন্দ্রনাথ এখানে এসেছিলেন। সেই সময় রবীন্দ্রনাথের ছবি আঁকা লেখা ইত্যাদি নানা তথ্য সমৃদ্ধ কাহিনীতে ভরপুর গ্রন্থখানি। এই গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনের গৃহগুলি কিভাবে নির্মাণ হচ্ছে, তাঁকে ঘিরে বিভিন্ন উৎসব-এর নানা কথা রয়েছে।

'শিল্পী গুরু অবনীন্দ্রনাথ' গ্রন্থটি অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনীমূলক গ্রন্থ। গ্রন্থটিতে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ি থেকে শুরু করে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বেলঘরিয়ার গুপ্ত নিবাসে থাকা জীবনের শেষ পর্বের কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়েছে। শিল্প সম্পর্কে অবনীন্দ্রনাথের নানান মূল্যবান তথ্য ও সরস বর্ণনা নৈপূণ্য এই গ্রন্থের আর এক মূল্যবান সম্পদ। যা অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্রুতিধরী রানী চন্দ আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন, যা বাংলা সাহিত্যের এক মূল্যবান সম্পদ হয়ে রয়েছে। গ্রন্থটির সূত্রপাত আমরা পাই অবনীন্দ্রনাথের মতো বিশাল ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্য কিভাবে তিনি লাভ করলেন তাঁর কথা। এরপর তিনি লিখছেন- ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্ট-এর ছবির একজিবিশিনে তিন ভাই আসতেন- প্রথমে থাকতেন বড় ভাই- গগনেন্দ্রনাথ, পরে মেজোভাই সমরেন্দ্রনাথ এবং শেষে অবনীন্দ্রনাথ। "কখনো দেখিনি গগনেন্দ্রনাথের আগে অবনীন্দ্রনাথ বসে পড়েছেন কৌচে। এমনই ছিল তাঁদের রীতি বা শিষ্টাচার"[১৬] এই গ্রন্থে শিল্প, আর্ট, মোগল পেন্টিং, কুটুমকাটাম রচনা ও শান্তিনিকেতনের সিরিজ-এর ছবির কথা বিস্তারিত ভাবে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। ছবি সম্পর্কে বলতে গিয়ে অবনীন্দ্রনাথ রানী চন্দ-কে বলেছেন- ছবির মধ্যে রয়েছে দুটি কথা, একটি হল ফর্ম। অর্থাৎ ছবির গড়ন। গাছ-মানুষ, কুড়ে ঘর- এই রূপটিকে ভালো করে দেখতে শিখতে হবে। কারণ স্থান বদলের সঙ্গে সঙ্গে এর রূপ বদলে যায়। যেমন ধানের মরাই- খোলামাঠে তার যে রূপ। গেরস্তের বাড়িতে তাঁর অন্যরূপ। আর দ্বিতীয়টি হল রঙ, রঙের মাধ্যমে তুমি ভাবটি ফুটিয়ে তুলবে, যে ভাব তোমার মনে জেগেছে, এখানেই মুক্তি পাবে ফর্ম। এটি কঠিন জিনিস হলেও এটিই হল ছবি আঁকার আসল কথা।

স্মৃতি কথামূলক গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে- 'আমার মা'র বাপের বাড়ি'- গ্রন্থটি। ১৩৮৪ সালে ১লা বৈশাখ গ্রন্থটি বিশ্বভারতী প্রকাশনা কলকাতা থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটিতে রানী চন্দ লিখেছেন- 'আমার মা'র বাপের বাড়ি গঙ্গাধরপুরে, বিক্রমপুরের ছোট্ট একটি গ্রাম - ছায়ায় ঢাকা, জলে সবুজে ভরা। আগে এর নাম ছিল- 'গঙ্গাধর খোলা'। আসে পাশে সব নাম ডাকের গ্রাম। তাঁর মাঝখানে গঙ্গাধর খোলা- যেন মাথা তুলতে পারে না কোনো কিছু নিয়ে। মামারা বড়ো হয়ে সদরে লেখালেখি করে 'খোলা' বদলে 'পুর' করলেন, গঙ্গাধর-খোলা হল গঙ্গাধরপুর।

যেন সে নামে এখন খানিকটা সভ্য হয়ে জাতে উঠল'।[১৭] পিতার মৃত্যুর কিছুদিন পর গেন্ডারিয়ার বাড়ী ছেড়ে মামার বাড়ী গঙ্গাধরপুর গ্রামে বসবাস করেন। ১৯২৭ খ্রীঃ কলকাতায় চলে আসার আগ পর্যন্ত এই গঙ্গাধরপুর গ্রামের কাহিনী রয়েছে। শৈশবের স্মৃতি কথা বলতে রানীর তাই মামার বাড়ীর ঘটনা- তার কথায় 'মা'র মাপের বাড়ি- যেন মা'র সিংহাসনখানি। আট ভায়ের এক মাত্র বোন। বড়ো মামার পরে মা- মা'র পরে আর সাত ভাই। মা ছিলেন দাদামশায়ের চোখের মণি। সেই মণিটি দাদামশায়ের যেন গঙ্গাধরপুরের মাটিকে উপহার দিয়ে গিয়েছিলেন। গাঁয়ের গর্ব ছিলেন মা।' মা'র বাপের বাড়ি থেকে নানান ঘটনা থেকে রানীর শিল্পী মানস গড়ে উঠেছিল- একটি বর্ণনা রয়েছে- 'তরকারি কোটায় মা'র বরাবরের শখ। মা তরকারি কেটে গামলার জল ধুয়ে ভাগে-ভাগে এমনভাবে থালায় বরাকোষে সাজিয়ে রাখেন, দেখে মনে হয় যেন দেবতার সামনে নৈবেদ্য সাজানো হয়েছে।'[১৮] ভাবী শিল্পী মনের আতুড় ঘর বুঝি এটিই।

রানী চন্দ তিনখানি ভ্রমণ উপন্যাস লিখেছেন। ১৩৫৯ সালে প্রকাশিত হয় কুম্ভ মেলার দর্শন অভিজ্ঞতা নিয়ে 'পূর্ণকুম্ভ' উপন্যাসটি। উপন্যাসটির শুরুতে পরে লিখেছেন- চোখের জলে গুলিয়ে গেল বারে বারে, শেষে সেই হিসাব ভুলবার জন্যই বেরিয়ে পড়লাম একদিন আমি সব কিছু পিছনে ফেলে। চলেছেন হরিদ্বারে-অমৃতকুম্ভে। আসলে লাভক্ষতির হিসাবের এর বাইরে মানুষ যখন নিজেকে টেনে নিয়ে যায়- তখন সে এই গতানুগতিক যান্ত্রিক জীবন থেকে মুক্তি পায়-সার্থক ভ্রমণের এটি একটি লক্ষণ, পূর্ণকুম্ভ, ব্রজরাজ ও তীর্থবারি এই তিনটি ভাগে বিন্যস্ত উপন্যাসটি। রয়েছে হরিদ্বারে যাত্রার কাহিনী, রামকৃষ্ণ মিশনে গিয়ে ওঠা। কনখল দর্শন, ব্রহ্মকুণ্ড, নাগা সন্ন্যাসী, শঙ্করাচার্যের বর্ণনা। তাঁর বর্ণনায় যেন আশ্চার্য ছবি প্রত্যক্ষ করি আমরা, যেমন পূর্ণকুম্ভ উপন্যাসের এক জায়গায় লিখেছেন- "হাঁটতে হাঁটতে পুল পেরিযে চলে যাই ওপারে। অপূর্ব দৃশ্য ওখান থেকে এবার হরিদ্বারের। পাহাড়ের কোল ঘেসে সারিসারি দালান, তার কোল দিয়ে বয়ে চলেছে গঙ্গা তরতর করে। কারো সিঁড়ি ডুবিয়ে, কারো বারান্দা ভিজিয়ে, কারো বা ঘরের ভিতর উঁকি ঝুঁকি মেরে। ওখান থেকে তাঁর খেলা দেখে মন হেসে ওঠে খুশিতে। ওপারে বড়ো বড়ো গাছের ছায়ায় সবুজ ঘাসে ঢাকা স্নিগ্ধ মাটির আশ্রয়টুকু আড়াল করে রেখেছে নীলধারাকে গঙ্গার হাত হতে।"[১৯] একদিকে নিখুঁত বর্ণনা ভঙ্গি অন্যদিকে কৌতহলী মানসিকতা, সর্বপরি নিজস্ব ভাষারীতিতে চলিত গদ্যে কুম্ভমেলার অভিজ্ঞতাকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন-তা এক কথায় অনবদ্য।

১৩৬৩ সালের পৌষ মাসে রানী চন্দের 'হিমাদ্রি' গ্রন্থটি পৌষ মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। লেখিকার এটি দ্বিতীয় ভ্রমণ গ্রন্থ। হরিদ্বার থেকে তিনি এই গ্রন্থের বর্ণনা শুরু করেছেন- যাত্রার শেষ- কেদার-বদরী দর্শনে, কেদার বদরী মন্দির বৈশাখী অক্ষয় তৃতীয়াতে উন্মুক্ত হয়, ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার পর বন্ধ হয়ে যায়। ছয়মাস সেখানে সমাগম থাকে। রানীরা গিয়েছেন শরতের গোড়ায়। সেখানে হৃষিকেশের ঘাটের বর্ণনা, ধর্মশালা, কমলাবাঈ এর যেমন বর্ণনা রয়েছে, তেমনি রয়েছে পঞ্চপ্রয়াগের কথা। বশিষ্ঠকুণ্ড, যজ্ঞকুণ্ড প্রভৃতির বর্ণনা।

এরপর ১৯৭৮ সালে প্রকাশিত হয় তার সর্বশেষ ভ্রমণ গ্রন্থ- 'পথে ঘাটে'। পূর্ণকুম্ভ যেমন কুম্ভমেলার দর্শন অভিজ্ঞতা, হিমাদ্রি-কেদার-বদরী দর্শন, পথে ঘাটেতে এসে একেবারে অন্যছবি, নতুন কথা, ভারতবর্ষের মতো বিরাট দেশের বিচিত্র রূপ ধরা পড়েছে এই গ্রন্থে। আসলে স্বামী অনিল চন্দ কর্ম উপলক্ষে ভারতবর্ষে নানা স্থানে যেতেন। সেই সময় বেশ কয়েকবার রানী চন্দ ও তার সঙ্গী হয়েছিলেন, সেই সব কাহিনী নিয়ে এই গ্রন্থ রচনা। এক অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে তিনি ধরেছেন ভারতবর্ষের মানুষের সনাতন রীতিনীতি, আচার-আচারণ, পোশাক-পরিচ্ছেদ, ধর্মপালন প্রভৃতি। গ্রন্থটিতে ভারতবর্ষের উত্তরাপথ থেকে দাক্ষিণাত্য বহু অচেনা ভূখণ্ডের কাহিনী যেমন লিপিবদ্ধ করেছেন তেমনি রয়েছে আন্দামান ভ্রমণের রোমাঞ্চকর কাহিনী।

১৯৮৩ সালে প্রকাশিত হয় রানী চন্দের 'জোনানাফাটক' গ্রন্থটি। প্রথম মহিলা লেখিকা যার প্রত্যক্ষ কারা জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে এই গ্রন্থটি রচিত হয়। আসলে রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ ছাড়া আর একজন মানুষের অবদান রানী চন্দের জীবনের ছিল তিনি হলেন- গান্ধীজি। শান্তিনিকেতনে গান্ধীজির একটি নিজস্ব অস্বিত্ব রয়েছে।

বেশ কয়েকবার এসেছিলেন শান্তিনিকেতনে। বিশ্বভারতীর আর্থিক সংকটের দিনে বন্ধুত্বসুলভ সহায়তাও করেছেন গান্ধীজি। বিয়াল্লিশ সালে যখন ভারতছাড়ো আন্দোলনের ঢেউ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল- শান্তিনিকেতনও বাদ যায়নি। সেই সুত্রে রানীর জীবনও জড়িয়ে গেলো। রবীন্দ্রনাথ চলে যাওয়ার এক বছরের মধ্যেই এমন একটি জীবনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন যার সঙ্গে বাকি জীবনে আর কখনও মুখোমুখি হননি। জেল জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কাহিনী আমাদের সামনে অত্যন্ত বাস্তবতার সঙ্গে নিপুণ শিল্পীর মতো তুলে ধরলেন- যা বাংলা কারা সাহিত্যে এক অমূল্য সংযোজন।

'কুটুম কাটাম' গ্রন্থটি ১৯৮৭ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির সম্পাদনা করেছেন রানী চন্দ। গ্রন্থের শিরোনাম ছিল- 'অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর কুটুম কাটাম'। ১৯৩৩-১৯৪৩ এই দশ বছর ধরে সাহিত্যের জগতে এক নতুন সৃষ্টিকে উপহার দিয়েছেন- অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। গ্রন্থটিতে মোট আটান্নটি শিল্পকর্মের পরিচয় রয়েছে। মাটিতে পড়ে থাকা কাঠকুটো, রান্না ঘরে পড়ে থাকা কাঠ, আমের আঁটি, বাড়ির ফার্ণিচারের টুকরো- এমনি তুচ্ছ তুচ্ছ জিনিস নিয়ে গড়েছেন- অবাক করা সৃষ্টি সব-পায়রা, কুমীর, গাছতলায় উপাসনারত রবীন্দ্রনাথ, এমনকি চেয়ারে আসীন অবনীন্দ্রনাথ। অবনীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এক অবিস্মরণীয় কাজ করলেন রানী চন্দ। এক সুদীর্ঘ তথ্যবহুল সরস আলোচনা করলেন রানী চন্দ। কুটুম কাটামের প্রত্যেকটি সৃষ্টি সম্পর্কে আলো ফেলা এবং অবনীন্দ্রনাথের চিঠির অবিকল উদ্ধার করে পাঠককে সত্যিই সমৃদ্ধ করেছেন। ইংরাজী ও বাংলা ভাষার পাঠকরা একই সঙ্গে তৃপ্ত হয়েছেন এই দ্বিভাষিক মূল্যবান গ্রন্থটি হাতে পেয়ে।

সাহিত্য রচনা ছাড়া রানী চন্দের আর একটি বিশেষ পরিচয় হলো- তিনি ছিলেন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী। ১৯২৮ সালে ষোল বছর বয়সে শান্তিনিকেতনে আগমন এবং নন্দলাল বসুর তত্বাবধানে তাঁর চিত্রবিদ্যার অনুশীলন শুরু হয়।

তাঁর আঁকা উল্লেখযোগ্য চিত্রগুলির মধ্যে রয়েছে— রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সি.এফ.এণ্ড্রুজ, কৃষ্ণরাধা, রাধার বিরহ, আশ্রম ছায়ায়, সাঁওতাল নৃত্য, The Twin palms, The Streaks of Dawn, The Daughter-in-Law, At The Zaminder's Gate, Rainy Season, The Pines, Expectation, Life Sevening.

রানী চন্দের আঁকা চিত্র সংকলনগুলির মধ্যে রয়েছে— Twenty Five Lioncuts (with an introduction by Rabindranath Tagore, 1932), Rani Chanda: Drawings and Paintings (with a Foreword by Rathindranath Tagore, New Delhi).

১৯৩২ সালে কলাভবনের ছাত্রী থাকাকালে মুকুল দে'র তত্বাবধানে প্রকাশিত হয় তাঁর বিখ্যাত অ্যালবাম- Twenty Five Lioncuts, by Rani Dey, Published by M. Dey, 28 Chowringhee, Calcutta, বইটির ভূমিকা লিখেছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি লিখেছেন- 'I am glad to introduce to the public Miss Rani Dey, a student of the Art Department of Santiniketean. She has Real artistic talent as is evident in these few prints done by her showing genuine feeling for her subjects and natural skill in execution.'[20]

তাঁর এই লিনোকাট প্রকাশিত হওয়ার পর বিচিত্রা পত্রিকায় তাঁর সম্পর্কে বলা হয়- 'বাংলাদেশের জনসাধারণের মধ্যে এই তরুণী শিল্পীর তেমন পরিচয় হয়ত আজ পর্যন্ত নাই কিন্তু আমরা সর্ব্বতোভাবে আশা করি তাঁহার রচিত চিত্রগুলি প্রকাশিত হওয়ার পর একটি সপ্রশংস পরিচিত স্থাপিত হইতে কিছুমাত্র বিলম্ব হইবে না।[২১] শান্তিনিকেতনের কলাভবনই হলো তার চিত্র রচনার শুরু জল, টেম্পোরা, ক্রেয়ন, চেক এর সাহায্যে এবং উডকাট ও লিনোকাটের মাধ্যমেই তাঁর চিত্র রচনা, তাঁর রচনার মধ্যে প্রতিকৃতি, দৃশ্য এবং কৃষ্ণলীলা বিষয়ক চিত্র আছে। অল ইণ্ডিয়া ফাইন আর্টস অ্যাণ্ড ক্রাফটস সোসাইটির উদ্যোগে দিল্লীতে তাঁর প্রথম একক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। নভেম্বর ১৯৪৮-এ।

কলকাতার সরকারী আর্ট কলেজ এবং শান্তিনিকেতনের শ্রীভবনে তাঁর রচিত মিউর‍্যাল রয়েছে। পাটনা মিউজিয়ামে তাঁর অঙ্কিত বুদ্ধ সিরিজের চিত্রগুলি সংগৃহিত হয়েছে। অবন্দ্রীনাথ ঠাকুরের সঙ্গে একসময় তিনি তৈরী করেছিলেন- শান্তিনিকেতনে সিরিজ এর ছবিগুলি।

রানী চন্দ ছিলেন শান্তিনিকেতনের নব্যভারতীয় ঘরানার একজন শিল্পী। নন্দলাল বসুর প্রভাব এবং ভারতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ ভারতীয় চিত্ররীতিতে তিনি ছবি এঁকেছেন, উডকাট ও লিনোকাটে একসময় তিনি অনেক কাজ করেছেন সে রকম একটি অ্যালবাম তিনি নন্দলাল বসুকে উপহার দিয়েছিলেন। সম্প্রতি তাঁর জন্ম শতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে সেই ছবির একখানি অ্যালবাম পদর্শনীও হয়েছে কলাভবনে। বুদ্ধদেবের জীবনের যে চিত্রায়ন তিনি নন্দলাল বসুকে উপহার দিয়েছিলেন। সম্প্রতি তাঁর জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে সেই ছবির একখানি অ্যালবাম প্রদর্শনীও হয়েছে কলাভবনে। বুদ্ধদেবের জীবনের যে চিত্রায়ন তিনি করেছেন তাতে অজন্তার শেলীর ছাপ স্পষ্ট। টেম্পোরায় যখন ফুলের ছবি আঁকেন তা সত্যই আমাদের মুগ্ধ করে। ছবিতে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন জীবনের ইতিবাচক দিকগুলিকে। নেতিবাচকতা তিনি তাঁর রচনায় স্থান দেননি। ছবিতে যেমন তিনি দক্ষতার সঙ্গে সাদা কালোর বিভাজন করেছেন, তেমনি এক আশ্চর্য দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলেছেন গ্রামীন মেয়ের ছবি। খোলা জানালা দিয়ে কখনও মুগ্ধ হয়ে দেখেছেন বাইরের মুগ্ধ প্রকৃতিকে। অজস্র পাখির কুজন গীতি, যেন বাস্তবতার মধ্যে মিশে রয়েছে একটি মিষ্টি মধুরতা, সেই বাস্তবতার মধুরতায় বাংলাদেশের প্রথম মহিলা চিত্রশিল্পী হিসাবে তাঁর নাম বাংলা চিত্রসাহিত্যের জগতে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

সূত্র নির্দেশ:

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর -রোগশয্যায়, বিশ্বভারতী, কোলকাতা, ১৩৫০, পৃ: ২৫।
২। রানী চন্দ- আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ, বিশ্বভারতী, কোলকাতা, ১৪২২, পৃ: ৭৯।
৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-আরোগ্য (নারী), বিশ্বভারতী, কোলকাতা, ১৪১৭, পৃ: ৩৭।
৪। রানী চন্দ - আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ, বিশ্বভারতী, কোলকাতা, ১৪২২, পৃ: ৮০।
৫। অবনীন্দ্র ঠাকুর ও রানী চন্দ- ঘরোয়া, বিশ্বভারতী, কোলকাতা, ১৩৪৮, পৃ: ৭।
৬। তদেব-পৃ: ৭।
৭। তদেব-পৃ: ৭।
৮। তদেব-পৃ: ৮।
৯। তদেব-পৃ: ১৩।
১০। তদেব-পৃ: ১৫।
১১। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রানী চন্দ- জোড়াসাঁকোর ধারে, বিশ্বভারতী, কোলকাতা, ১৩৫১, পৃ: ৫।
১২। তদেব-পৃ: ৯।
১৩। রানী চন্দ- আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ, বিশ্বভারতী, কোলকারা, ১৪২২, পৃ: ১৩।
১৪। তদেব-পৃ: ৭
১৫। রানী চন্দ-গুরুদেব, বিশ্বভারতী, কোলকাতা, ১৩৬৯, পৃ: ৫।
১৬। রানী চন্দ-শিল্পী গুরু অবনীন্দনাথ, বিশ্বভারতী, কোলকাতা, ১৩৭৯, পৃ: ৭।
১৭। রানী চন্দ- আমার মা'র বাপের বাড়ি, বিশ্বভারতী, কোলকাতা, ১৩৮৪, পৃ: ১।
১৮। তদেব-পৃ: ৬।
১৯। রানী চন্দ-পূর্ণকুম্ভ, বিশ্বভারতী, কোলকাতা, ১৩৫৯, পৃ: ৩০।
২০। Rani Dey-Twenty Five Linocuts, Published by M. Dey, 28 Chowringhee Calcutta, 1932, p.1
২১। উপন্দ্রেনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বিচিত্রা, চৈত্র সংখ্যা, ১৩৩৮।